কুয়াশাঘেরা কাওনমোড়া

রণদীপ নন্দী

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

দিন দুই আগে মহা আতান্তরে পড়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ঘুরছিল, এটা আমি ঠিক কী লিখলাম রে বাবা!

দেখুন, ওজনদার অলংকার সাজিয়ে তুখোড় একখান ভূমিকা লেখা আমার মতো ফাজিল মানুষের কম্মো নয়। কিন্তু পাবলিশার চাপ দিচ্ছে, "আজ রাতের মধ্যে ভূমিকা-টুমিকা গোছের কিছু একটা নামাও। নইলে বইয়ের দ্বিতীয় পাতা সাদাই ছেপে দেব।" তাই ভাবলাম আমি বরং আমার সেই কেস খাওয়ার গল্প বলেই পাতা ভরাই।

তা ব্যাপার হল এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে প্রায় বছর দেড়েক মাথা চুলকেছি, আর তার পরের মাস ছয় ধরে খানিক লেখালেখি করেছি। এমনিতেই আমার নিজের লেখা একদমই না-পসন্দ। একটা করে লাইন লিখি, আর মনে হয়, "ছি! এটা কী লিখলাম! চলবে না চলবে না..."

এই করে শখের ল্যাপটপের ব্যাকস্পেসের ছাল-বাকল তুলে ফেলে অবশেষে উপন্যাস গোছের একটা কিছু নামিয়েছি। পাবলিশার চিরঞ্জীৎ দাস মহাশয় দয়াপূর্বক সেই লেখা ছাপতে সম্মতও হয়েছেন। সামনেই বইমেলা, তাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ঢাক বাজিয়ে একটু প্রমোশন না করলেই নয়। সেইমতো অভিব্রতর আঁকা একটা তুখোড় ইলাস্ট্রেশনকে সঙ্গী করে বুক ঠুকে ফেসবুকে দিলাম একখানা পোস্ট। প্রায় মিনিট তিনেক পরই একটা কমেন্ট এল, যেখানে এক পরিচিত পাঠক যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, "দাদা, উপন্যাসটার জঁর কী?"

ঠিক এইখানেই হল কেলেঙ্কারিটা। মাথা ভনভন, পেট গুড়গুড়। শেষে নিজের লেখা উপন্যাসের জঁর ঠাহর করতে পারছি না! হায় রে! মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি।

শেষে অনেক চিন্তাভাবনা করে, মাথার ভিতর প্যাঁচপয়জার কষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এরপর কেউ জিজ্ঞেস করলে সপাটে উত্তর দেব— আমার এই উপন্যাস এক সম্পূর্ন নতুন জঁরের, যার আবিষ্কর্তা হলেন এই শর্মা, আর জঁরের নাম হল যাচ্ছেতাই। মানে যা ইচ্ছে, তাই। এই আজব উপন্যাসের জঁর সম্পূর্ণভাবে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ন্যস্ত। আপনি যেভাবে এই বইকে পড়তে চান, বই সেভাবেই আপনার কাছে নিজেকে ধরা দেবে। যদি থ্রিলার হিসাবে পড়তে চান তো থ্রিলার, যদি অ্যাডভেঞ্চার হিসাবে পড়তে চান তো অ্যাডভেঞ্চার, যদি জীবনবোধের গল্প হিসাবে পড়তে চান তাহলে তা-ই।

আসলে এই গল্প একটা নদীর গল্প। ধরে নিন নদীটার নাম সময়। সেই নদীর তীরে জন্ম নেওয়া সবুজ নরম গুল্মের মতো কিছু মানুষের গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবকিছুই এই গল্পে ভিড় জমিয়েছে। আর আছে

সবুজ; গহিন অরণ্য, আকাশ ছুঁয়ে ফেলা ঘুম-পাহাড়ের সারি। আছে অলস ঝিমঝিম সন্ধ্যে, আছে আশঙ্কা ভরা রাতের উৎকণ্ঠা। আছে সর্বহারা এক বাবার বুকফাটা কান্না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক অসহায় সন্তানের শক্ত চোয়াল।

মোটকথা হল গল্পটা আদতে আমাদেরই, বুঝলেন তো। এই ফাঁকে বলে রাখি, এই গল্প লেখায় আমার বিশেষ মুনশিয়ানা নেই। আমি খুব চাতুরী করে আপনাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা টুকরো-টাকরা আবেগগুলো সেলাই করে কোলাজ বানিয়ে সেই গল্প আপনাদেরই বিক্রি করছি। যাক গে, যা শুনেছেন, চেপে যান। পাঁচকান করে কাজ নেই। তার থেকে আসুন ডুব দিই পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অদ্ভুত জনপদ এই কাওনঝোড়ার কাহিনীতে। পরিচয় করি রাই, মেঘনা, অভিষেক রাঠোর বা রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরির সঙ্গে। পরিচয় করি পুত্রশোকে উন্মাদ এক বাবার সঙ্গে, জীবনের খেই হারানো চালচুলোহীন এক সুরেলা মানুষের সঙ্গে।

ঘেঁটে যাচ্ছেন বুঝি? দাঁড়ান, একটু গুছিয়ে শুরু করি আর একবার। এই গল্পের শুরুতে পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা গ্রাম কাওনঝোড়ায় এক মিশনারি স্কুলের শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে আসে শহর কলকাতায় বড়ো হওয়া রাইমা। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই এই আদিম পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে সে। এই পাহাড়ি জঙ্গলের মায়া তাকে টানে, আর টানে ডেভিড। রহস্যাবৃত সেই মানুষটা, যার ভুলে যাওয়া স্মৃতির আড়ালে হয়তো লুকিয়ে আছে কোনো ভয়ংকর অতীতের হাতছানি। অবশ্য রাইয়ের নিজের অতীতও কম রহস্যাবৃত নয়। কেন নিজের আরামের শহুরে জীবন ছেড়ে সে এই অচিনপুরে চাকরি নিয়ে পড়ে আছে? এক বিপদের মুহূর্তে রাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয় এই জঙ্গলের মুকুটহীন সম্রাট ঠাকুরসাহাবের সঙ্গে। রেঞ্জার অভিষেক রাঠোরের মতে জঙ্গলের দুর্ধর্ষ ডাকাত শের বাগী নাকি এই ঠাকুর সাহাবেরই মদতপুষ্ট। সত্যিই কি তাই? অভিষেক কি পারবে শের বাগীকে কবজা করতে? ঠাকুরসাহাব আর অভিষেক রাঠোরের মধ্যে এই অহং-এর লড়াইতে কার পক্ষ নেবে রাই? আত্মভোলা, খ্যাপাটে ডেভিডের আত্মহত্যার চেষ্টা করার কারণ কি উদ্ধার করতে পারবে সে? উত্তর থাকছে এই উপন্যাসে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

পুনশ্চ : যাবার বেলা চুপিচুপি একটা কথা বলে যাই, এই গল্প এক এমন আজব গল্প, যেখানে কেউই একশো শতাংশ ভালোমানুষ নয়। ঠিক যেমন আপনি বা আমি নই।

রণদীপ নন্দী
জানুয়ারি ২০২৩
কলকাতা

প্রথম পর্ব

কাওনঝোড়ার চিতা

জায়গার নাম কাওনঝোড়া। গোধূলি নেমেছে। পাহাড়ি গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে এই এলাকায় এখনও কংক্রিটের জঞ্জাল জমা হয়নি। অতল খাদের পাশে কোনোক্রমে জায়গা করে নিয়েছে ফিতের মতো আঁকাবাঁকা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। ঘন ঘন বাঁক নিতেই যেন একপাশে হেলে যাচ্ছে গাড়িটা। রাই প্রতিবার চমকে চমকে উঠছে। বহু বছর হয়ে গেল রাই পাহাড়ে আসেনি। সমতলের জ্যামে জর্জরিত হয়ে রাস্তায় ঘামতে ঘামতে স্কুলে যেতে অভ্যস্ত সে। এই আকাশছোঁয়া পাহাড়, অতলস্পর্শী খাদ, গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে অনধিকার প্রবেশ করা ভেজা মেঘ— এইসবই তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। ভীষণ মনে পড়ছে বাড়ির কথা, তার সেই ফেলে আসা চেনা, ঘিঞ্জি, নোংরা শহরটার কথা। একফোঁটা অবাধ্য অশ্রু ছিটকে আসে চোখের কোণে। ডানহাতের তালুর উলটোপিঠে সেটাকে বাঁধ মানায় সে।

গাড়িটা এসে থামে একটা বিশাল কাঠের পাঁচিলের সামনে। বড়ো লোহার গ্রিল গেট খুলে যায় সশব্দে। গাড়ি মোরাম বিছানো রাস্তা পেরিয়ে থামে একটা বেশ পুরোনো উঁচু কাঠের বিল্ডিং-এর সামনে। মোটা কাঠের থাম, উঁচু খিলান, কাঠের রেলিং। লাল রং সময়ের আঘাতে মলিন। ত্রস্তপায়ে নেমে আসে রাই। চারিদিকে একবার চোখ বোলায়। একটা থমথমে নিস্তব্ধতা কেমন যেন গ্রাস করেছে চারপাশের পরিবেশ। দূরে স্কুল বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। লাল রঙের বোর্ডে বড়ো হরফে লেখা— সেন্ট অগাস্টাস মিশনারি স্কুল। রাইকে দেখে এগিয়ে আসলেন একজন কালো পোশাক পরিহিতা মধ্যবয়স্কা মহিলা। বেশ লম্বা একহারা চেহারা, চোখের উজ্জ্বল মণিতে আপ্যায়নের উষ্ণতা, ঠোঁটে অমায়িক হাসি। রাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাতটা আলতো করে বাড়িয়ে দিলেন সামনে, "হ্যালো, ইউ মাস্ট বি রাইমা ডিসুজা। দ্য নিউ হিস্ট্রি টিচার। আমি সিস্টার জুলিয়া। ভেতরে এসো।"

রাই প্রত্যুত্তরে কিছু বলে না। শুধু সামান্য হেসে মাথা ঝাঁকায়। সিস্টার জুলিয়া হাতের ইশারায় তাকে ভিতরে আসতে বলে ঢুকে যান ভিতরের লম্বা করিডোরে। তাঁকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে ঢুকে আসে রাই। বাইরে আলো কমে এসেছে। এখানে ঘরের মধ্যে আরও জমাটি অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর চোখ সয়ে এলে দেখা যায় লম্বা করিডোরটা। করিডোরের দু'প্রান্তে সারি সারি ঘর। কয়েকটা তালাবন্ধ, বাকিগুলোর দরজা ভিতর থেকে ভেজানো। কিছুটা যাওয়ার পর করিডোরটা এল শেপে ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে। এদিকে পর পর দুটো ঘর, তারপর সরু সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। দোতলায় দুটো ঘরের একটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন সিস্টার। নরম গলায় বললেন, "এটা টিচার্স কোয়ার্টার। আর এই হল তোমার ঘর। এমনিতে আমরা দু'জনে রুম শেয়ার করি, কিন্তু আপাতত এই ঘরে তুমি একাই থাকবে। আসলে এখন সামার ভ্যাকেশন চলছে। ক্লাস শুরু হবে সামনের ফ্রাইডে থেকে। এখন বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এবং টিচার্সরাই বাড়িতে গেছে। দিন দুয়েকের মধ্যেই সবাই চলে আসবে, মে বি তখন তোমায় একজন রুমমেট অ্যালট করা হবে।"

রাই হাসে। আলগোছে চোখ বোলায় ঘরের চারদিকে। ছোট্ট ছিমছাম ঘর। দু'দিকে দুটো সিঙ্গেল বেড। সাদা দেয়ালে পোশাক ঝোলানোর হুক। খাটের লাগোয়া দুটো স্টাডি টেবিল। আর খাটের পাশে একটা বিশাল জানালা। সে দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়ায় জানালার পাশে। ডানহাতের আলতো ঠেলায় কাচের পাল্লাটা খুলে দিতেই এক ঝলক দামাল হাওয়া এসে ঘেঁটে দিয়ে যায় রাইয়ের চুল। সে তার নরম আঙুলের শাসনে চুলগুলোকে সামলে নিয়ে জানালার বাইরে তাকায়। মরা চাঁদের আলোয় চারিদিক কেমন যেন নীলাভ দেখাচ্ছে। দূরে সারি সারি পাহাড়ের চূড়া মেঘের চাদরে ঢেকে আছে। সেই পাহাড়ের গায়ে মিটিমিটি আলো জ্বলছে নিভছে। যেন নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং সেই আকাশছোঁয়া পর্বতের সারি ওই ধূসর মেঘগুলোর আশকারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মনটা হঠাৎ কেমন ভালো হয়ে গেল রাইয়ের। একটা গুমোট ভ্যাপসা গরম জমে ছিল কোথাও, এই শীতল হাওয়া সেটাকে মুছে দিল বেমালুম।

"রাইমা।"

"হুঁ...! সরি। হ্যাঁ বলুন, আপনি কিছু বলছিলেন?"

"বলছিলাম তুমি এখন তাহলে একটু রেস্ট নাও। রাতে ডিনারের সময় নিচে ডাইনিং রুম থেকে একটা ঘণ্টা বাজবে। একটু খেয়াল রেখো। এখন কিছু খাবে? এতটা জার্নি করে এলে..."

"না না। আমার কাছে শুকনো খাবার আছে। থ্যাংকস।"

সিস্টার জুলিয়া মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সন্ধ্যা শেষের যে ম্লান আলোটুকু কাচের জানালা বেয়ে চুঁইয়ে ঢুকছিল ঘরে, সেটুকুও ঝুপ করে নিভে গিয়েছে। ঘরের ভিতরে একটা অস্বস্তিকর অন্ধকার। রাই খাটের পাশে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। শক্ত গদির বিছানা, সাদা চাদর পাতা। মাথার কাছে চুপসে যাওয়া একটা বালিশ। সে হাত বাড়িয়ে বালিশটাকে মাথার নিচে টেনে নেয়। ওই দরজার কাছে সুইচবোর্ড। ঘরের লাইটটা জ্বালানো প্রয়োজন। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা নরম আলস্য তাকে গ্রাস করেছে। ধীরে ধীরে অজান্তেই চোখ বুজে আসে।

"রাইমা, রাইমা..."

ধড়ফড় করে উঠে বসে রাই। শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকায়। তার পাশে বসে আছেন সিস্টার জুলিয়া। হাতে একটা এনামেলের প্লেট। নরম গলায় বললেন, "বেল শুনে আসোনি দেখেই বুঝেছি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই ভাবলাম একটু ঘুমাতে দিই, ডিনার শেষ হলে তোমার খাবার নিয়েই চলে আসব।"

"এ মা, না না! কী দরকার ছিল..." লজ্জায় গুটিয়ে গেল রাই।

উত্তর না দিয়ে মিষ্টি করে হাসেন জুলিয়া। হাতের প্লেটটা খাটের পাশে টেবিলের ওপর নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শব্দ ঠিক নয়, গান। রাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল হস্টেলের চৌহদ্দির বাইরে মোরাম বিছানো রাস্তা ধরে কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে। তবে তার হাঁটাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন আড়ষ্টভাবে সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষটা। তবে গলা ছেড়ে গান গাওয়ার মধ্যে কিন্তু কোনো আড়ষ্টতা নেই। অদ্ভুত গলা মানুষটার। বর্শার ফলার মতো সূচালো। হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে তাকায় রাই।

"ওটা ডেভিড। বড়ো ভালো ছেলে। কাছেই পাহাড়ি বস্তিতে থাকে। কী সুন্দর গান গায় শুনেছ? সারাদিনই পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।"

"কিন্তু..."

"ওরকম করে হাঁটছে কেন, তাই তো? আসলে ওর চোখের সমস্যা আছে। এইটটি পার্সেন্ট আইসাইট চলে গেছে। এমনকি কানেও কম শোনে।"

"এ বাবা! সে কী!"

"হ্যাঁ, অনেক বছর আগে এই স্কুলেরই খুব ব্রাইট স্টুডেন্ট ছিল। তখন আমি ইয়াং, সবে জয়েন করেছি এখানে। হঠাৎ একদিন শুনি পাহাড় থেকে নাকি ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করতে গেছে। প্রায় মাস খানেক ধরে যমে-মানুষে টানাটানির পর বেঁচে ফিরে এল বটে, কিন্তু তারপর থেকে কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেল ছেলেটা। শুনেছিলাম ক্রিটিকাল অ্যামনেশিয়ায়

আক্রান্ত। পুরোনো স্মৃতি নাকি হারিয়ে ফেলেছে অনেকটা। একদিন জিজ্ঞেস করায় বলেছিল শুধু ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি মনে পড়ে মাঝে মাঝে, বাকি সব ঝাপসা। তারপর হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে পালাল। গরিব বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। তারা তো কেঁদে কেঁদে অস্থির। প্রায় বছর দশেক পর আবার ফিরে এল। বাবা-মা মারা গেছেন ততদিনে। তারপর থেকে এভাবেই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় একা একা, গান গায়। সঙ্গে অস্ত্র বলতে কেবল একটা গুলতি। নিজের বাড়িটাকে একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলেছে। শুনেছি শহরে পালিয়ে কোনো ভালোমানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। অনেক পড়াশোনা করেছে। কিন্তু জানি না কেন আবার পালিয়ে এল এখানে।"

"কী করেন উনি?"

রাইয়ের এই প্রশ্নে মৃদু হাসেন সিস্টার জুলিয়া। তারপর উদাস গলায় বলেন, "কিছুই না। নিজের মতো ঘুরে বেড়ায়। কারুর বেড়া বাঁধতে লাগবে, কারুর মোষ চরাতে লাগবে, সব কাজে হাসিমুখে হাজির। কিন্তু থিতু হয়ে কোনো কাজ করবে না। কতবার কত লোকে চাকরি দিতে চেয়েছে। দু'দিন গিয়ে আর যায়নি। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন চলে যায়। সাত-দশদিন কোনো খবরই নেই! তারপর হঠাৎ আবার দেখা যায় জঙ্গলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, গান গাইছে। আলাপ হলে বুঝবে। কী সুন্দর ব্যবহার! বড্ড গুছিয়ে কথা বলে। সহজ-সরল ছেলেটার গলা শুনলেই মনটা কেমন করে ওঠে। দ্যাট পুওর চাইল্ড! মে গড ব্লেস হিম।" কথা শেষ করে গলায় ঝুলন্ত ক্রুশটা মাথায় ঠেকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগলেন সিস্টার জুলিয়া।

রাই আবার জানালায় চোখ রাখল। এখন আর দেখা যাচ্ছে না ছেলেটাকে। শুধু গানটার একটা আলতো রেশ রয়ে গেছে তখনও। ওই দূরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে লুকোচুরি খেলা টিমটিমে আলোগুলোর মধ্যে মিশে গেছে সেটা। মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল তার। জুলিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। বহুক্ষণ অন্ধকারে থেকে চোখদুটো সয়ে এসেছিল। আলোয় বড়ো অস্বস্তি হচ্ছে। পাশে রাখা থালাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে রুটি সবজি কোনোক্রমে গলধঃকরণ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

***

"সিরিঞ্জের বাক্সটা আবার কোথায় রাখলাম! এই রাই, ভেতরে টেবিলে একবার দেখো তো।" সিস্টার মারিয়া ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন। রাইমা দ্রুতপায়ে ভিতরে ঢুকতে গেল, সিস্টার জুলিয়ার সঙ্গে আর একটু হলে ধাক্কা লেগে

যাচ্ছিল। জুলিয়ার হাতে ধরা তুলোর প্যাকেট। চোখ রাঙিয়ে কপট রাগী স্বরে বললেন, "আই মেয়ে! দেখে চলতে কী হয়! অত তাড়া কীসের?"

স্কুলে বাচ্চাদের জন্য ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। স্কুলের বাচ্চারা ছাড়াও আশেপাশের পাহাড়ি গ্রাম থেকে বাচ্চারা এসেছে। লম্বা একটা টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলের এককোণে বসে একজন সুন্দরী নার্স ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। একটু দূরে খোলা আকাশের নিচে একদল ফুটফুটে ফুলের মতো বাচ্চা ছোটোছুটি করছে। তাদের কলকাকলি, ভ্যাকসিন নেওয়া বাচ্চাদের কান্না, তাদের পরিজনের এবং উদ্যোক্তাদের হইচই— সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত পরিবেশ। খারাপ লাগছে না রাইয়ের। এখানে আসার পর মাস দুয়েক কেটে গেছে। শহরের জন্য এখন আর মনকেমন করে না। এখানকার একটু অন্যরকম পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছে সে। রোজ সকালে অনিচ্ছার সঙ্গে আড়মোড়া ভেঙে ঘুম থেকে ওঠা, জানালা খুললেই হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া ঠান্ডা হাওয়ার দমক, সকালের প্রেয়ার, সারাদিন ক্লাস নেওয়া, বাচ্চাদের মারপিট... সবকিছু সামলে দিনের শেষে ওই দূরের নীল পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যেতে দেখা, গহিন জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে আসা নাম-না-জানা প্রাণীদের ডাক, রাতে ঘণ্টাধ্বনি শুনে ডিনারের টেবিলে যাওয়া, সবকিছুর সঙ্গে ও কেমন যেন সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে নির্জনে এসে দাঁড়ায় রাই। সামনে গভীর খাদ নেমে গেছে। প্রথম প্রথম সেদিকে তাকালে ভীষণ অস্বস্তি হত, এখন বরং আরাম লাগে। দূরে ফিতের মতো সরু ধূসর রাস্তা দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ রাইয়ের চোখে পড়ল সেই রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে একজন একলা মানুষ। খুব সন্তর্পণে ভারসাম্য রক্ষা করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছড়িয়ে থাকা জঙ্গলের দিকে। মানুষটাকে কখনও সামনাসামনি দেখেনি রাই। শুধু মাঝে মাঝে তার জানালার পাশের সরু রাস্তার বাঁকে বাঁকে তার দীর্ঘ অবসন্ন শরীরটা হারিয়ে যেতে দেখেছে, তার উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনেছে, কখনও আবার হারমোনিকার মোহময় সুরের মূর্ছনা শুনেছে। এইটুকুই পরিচয় তার মানুষটার সঙ্গে। তবু কেন জানে না, তার মনে হয় এই লোক তার ভীষণ চেনা। কতই বা আর বয়স হবে, হয়তো তারই বয়সি কিম্বা সামান্য বড়ো। দূর থেকে দেখেছে তার উসকো-খুসকো কোঁকড়ানো চুল, ছাই রঙের ঢোলা পোশাক, হাতে ধরে রাখা একটা সবুজ রঙের হারমোনিকা। মানুষটাকে ভীষণ যত্নআত্তি করতে ইচ্ছে করে রাইয়ের। কেন করে, সেই বেয়াড়া প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই।

"কী রে! এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে চুপচাপ?" সিস্টার মেঘনার ডাকে সংবিৎ ফেরে রাইয়ের। মেঘনা ওর থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো হবে। মাস ছয়েক হল জয়েন করেছে। ইংরেজির শিক্ষিকা, কিন্তু ভীষণ গুছিয়ে বাংলা বলতে পারে। কিছু মানুষ থাকে যাদের সঙ্গে কথা বলে মনের আরাম মেলে। মেঘনা তাদের মতোই একজন। অসমবয়সিদের ভিড়ে বেচারি খেই হারাচ্ছিল। রাই আসার পর তাই মেয়েটা একটু অক্সিজেন পেয়েছে। বয়সে একটু বড়ো হলেও একটা নিখাদ বন্ধুত্ব উপহার দিয়েছে মেঘনা রাইকে।

"কিছু না রে। ভালো লাগছে।"

"চল, নিচের দিকে হাঁটি। ওই দেখ, ওইখান থেকে নামার রাস্তা রয়েছে।"

পাকদন্ডি রাস্তা বেয়ে নিচের দিকে নামতে নামতে অনেক গল্প করতে লাগল মেঘনা। কাজের কথা নয়। অকাজের গল্প। ওই বস্তির ওপারে পাহাড়ের পাদদেশ বরাবর উঠে যাওয়া পাহাড়ে নাকি ক'দিন আগেই একটা চিতা খুব উপদ্রব করছিল কিংবা সামনের ওই উঁচু পাহাড় থেকে যে চাপা আওয়াজটা আসছে সেটা নাকি জঙ্গলের গাছ কাটার। জঙ্গলের ইজারা পেয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরি। শোনা যাচ্ছে নাকি কাঠকল বসাবেন সেখানে। এই ভদ্রলোকের নাম যদিও আগেও শুনেছে রাই। জঙ্গল জুড়ে মানুষটার সুনাম আর দুর্নাম দুই-ই সমান প্রচলিত। একরোখা, একগুঁয়ে জনদরদী মানুষ। পাহাড়ি কুলিকামিনদের জন্য কম কিছু করেননি। তবে মানুষটাকে আইনের দাঁড়িপাল্লায় মাপতে গেলে নাকি তেমন সুবিধা হয় না। অবশ্য এই পাহাড়-জঙ্গলে সমতলের আইনকানুন খাটেও না। এখানে প্রকৃতির মতো কিছু মানুষও নিজের খেয়াল চলে। অবাধ্য, দুর্বিনীত। রুদ্রপ্রসাদ হয়তো তাদেরই মতো। রাই বুঝল মানুষটাকে নিয়ে তার মনে কৌতূহল জমেছে। সে প্রশ্ন করল, "এই রুদ্রপ্রসাদবাবুর সঙ্গে তোর আলাপ আছে? এখানে আসার পর থেকে অনেক শুনেছি লোকটার কথা।"

"হুঁ, তা আছে অল্পস্বল্প। ওঁর ছেলে তো আমাদের স্কুলেই পড়ে। ওদের বাংলো খুব দূরে নয়, কাছেই। কিন্তু রুদ্রবাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন বছর তিনেক হল। উনি নিজেও সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। ছেলেটাকে তাই আমাদের বোর্ডিংয়েই রেখেছেন।"

মন মাতাল করা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে। মহুয়ার গন্ধ। কেমন যেন নেশা লেগে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে। ভাল্লুকরা নাকি মধ্যরাতে এই গন্ধের টানে ছুটে আসে। মহুয়ার ফল খেয়ে নেশাতুর হয়ে পড়ে থাকে গাছের নিচে। জঙ্গলের ভিতর থেকে হারমোনিকার আওয়াজ ভেসে আসছে। মেঘনা অন্যদিকে হাঁটছিল। রাই তার কনুইয়ের কাছে আলতো চাপ দিয়ে

হাঁটতে লাগল সেই শব্দ লক্ষ করে। ভীষণ মনখারাপি একটা সুর। সেই সুরের মাদকতায় সম্মোহিত হয়ে এগোতে থাকে দু'জনে।

জঙ্গল যেখানে ঘন হয়েছে, গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়িগুলো যেখানে হাত ধরাধরি করে আরও কাছে সরে এসেছে, সেখানে একটা বিশাল শাল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন মানুষ। সেই মলিন ঢোলা পোশাক, উসকো-খুসকো দাড়ি, বন্ধ চোখ। ওরা যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মানুষটা মোটেই টের পায়নি। মেঘনা এগিয়ে গিয়ে ডাকতে যায়। রাই বাধা দেয়। সে চায় না এই সুরটা বাধা পাক, থেমে যাক। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফেরার পথ ধরে তারা। দূরে পাহাড়ের উপর থেকে গাছ কাটার ইলেকট্রিক করাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে ডানা মেলে উড়ে যায় একজোড়া পিউকাঁহা পাখি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামছে। গনগনে রোদ নরম হয়ে গেছে। লালচে সোনালি সূর্যটা আকাশের এককোণে গোঁত্তা খেয়ে ঝুলছে। আবার সেই মিষ্টি মায়াবী গন্ধ। বেলাশেষের নরম রোদ গায়ে মেখে ওরা বেরিয়ে আসে জঙ্গলের বাইরে। খানিক এগিয়ে দেখে খাড়াইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছেন সিস্টার জুলিয়া। চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট।

মনে মনে প্রমাদ গুনল রাই। নিশ্চয়ই না বলেকয়ে চলে আসার জন্য বকা শুনতে হবে। ওপরে উঠে এসে আগেই নিজেদের সাফাই গাইতে যাবে, তার আগেই সিস্টার জুলিয়া অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে!"

চমকে উঠল দুজনেই। কথাটা বলেই সিস্টার জুলিয়া পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করেছেন। অবশ্য সেটাকে হাঁটা না বলে ছোটা বললে বাহুল্য হয় না। রাই এবং মেঘনা রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে তাল মেলাতে। অবশেষে যখন তারা সেই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের সামনে এসে পৌঁছল, চারিদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে আছে। একটু আগের সেই উচ্ছল প্রাণবন্ত পরিবেশের সঙ্গে এই থমথমে আবহাওয়ার কোনো মিল নেই। দূরে একজন দেহাতি মহিলা দু'হাতে বুক চাপড়ে কাঁদছে। তার বিলাপের আওয়াজ এই চাপা নিস্তব্ধতাকে ভাঙচুর করে দিচ্ছে। সিস্টার জুলিয়াকে দু-তিনবার প্রশ্ন করার পর তিনি একটু কেটে কেটে যা উত্তর দিলেন তাতে বোঝা গেল এই মহিলার ছেলে খেলতে খেলতে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। কম্পাউন্ডের ভিতর বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে না পাওয়ায় জঙ্গলের দিকে খোঁজ শুরু হয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটার রক্তাক্ত চটি পাওয়া যায়। সঙ্গে আশেপাশে থাবার ছাপ। এখনকার স্থানীয় মানুষেরা এই ছাপ চেনে। বেশ বড়ো আকারের মাদি চিতা। যদিও জঙ্গলে ঢোকার

সাহস কারুর হয়নি এখনও। রেঞ্জারসাহেবের আসার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। স্টুডেন্টদের ইতোমধ্যেই হস্টেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দরজার কাছে এখনও ভিড় করে আছে কিছু স্থানীয় লোকজন, কাছের মিশনারি হসপিটাল থেকে আসা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের কর্মীরা আর স্কুলের শিক্ষিকারা।

জুলিয়া পুরো ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তাঁর শেষ কথাগুলো একটা যান্ত্রিক আওয়াজে চাপা পড়ে যায়। চাপা গর্জন তুলে জংলা সবুজ রঙের জিপ পাকদন্ডির রাস্তা বেয়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই। রাই বুঝল এটাই রেঞ্জারের গাড়ি। 'রেঞ্জারসাহেব' বলতে যেমন মানুষকে কল্পনা করেছিল সে, সেই হিসেব মিলল না। গাড়ি থেকে নেমে এলেন ক্ল্যামোফজড টি-শার্ট এবং জিন্‌স পরিহিত একজন পুরুষ। বয়স তিরিশের কোঠায়, সুঠাম চেহারা, নিপুণ হাতে কামানো দাড়িগোঁফ। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে তিনি এগিয়ে এলেন রাইয়ের দিকেই। ফর্মাল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যালো, মাইসেলফ অভিষেক রাঠোর। আমি এই রেঞ্জের দায়িত্বে আছি। প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম কোথায় আছেন জানতে পারি?"

সিস্টার মারিয়া এগিয়ে এলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না। তাঁর চোখেমুখে তখনও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

"ম্যাডাম, প্রথমে চটিটা কে দেখে?"

মারিয়াকে উত্তর দিতে হল না। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন অল্পবয়সি ছেলে এগিয়ে এল। অভিষেক চোখের ইশারায় তাকে বলল জায়গাটা দেখিয়ে দিতে। সিস্টার মারিয়া হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। ত্রস্ত গলায় বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন, "গার্লস, তোমরা ভিতরে যাও। ডোন্ট স্ট্যান্ড হিয়ার। প্লিজ।"

***

রাত গভীর হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে রাতের একটা নিজস্ব শব্দ থাকে। ঝিঁঝির ডাক, রাতচরা পাখির কর্কশ আওয়াজ, পাহাড়ি এবড়ো-খেবড়ো গেমট্র্যাক ধরে বন্য পশুদের কাছাকাছি কোনো নুনিতে জল খেতে যাওয়ার শব্দ— সব মিলেমিশে একটা অদ্ভুত পরিবেশ। অন্যদিন সেই শব্দটা ভীষণ আরাম দেয় রাইকে। কিন্তু আজ সেই একই শব্দ তার মনে ভীষণ অস্বস্তির জন্ম দিচ্ছে। তার সেই প্রিয় কাচের জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই যে চাপ চাপ বন্য অন্ধকার চোখে পড়ে, বার বার মনে হচ্ছে সেখানে বুঝি একজোড়া জ্বলজ্বলে হলুদ চোখ অপেক্ষা করছে মুহূর্তের অসাবধানতার। দূরে স্কুলের চৌহদ্দির একদম শেষে আগুন চোখে পড়ছে। সেখানেই ক্যাম্প করে